BIDDABARI EDITORIAL

ফারাক্কার ৫০ বছর : বাঁধ যখন নদীর মরণফাঁদ!

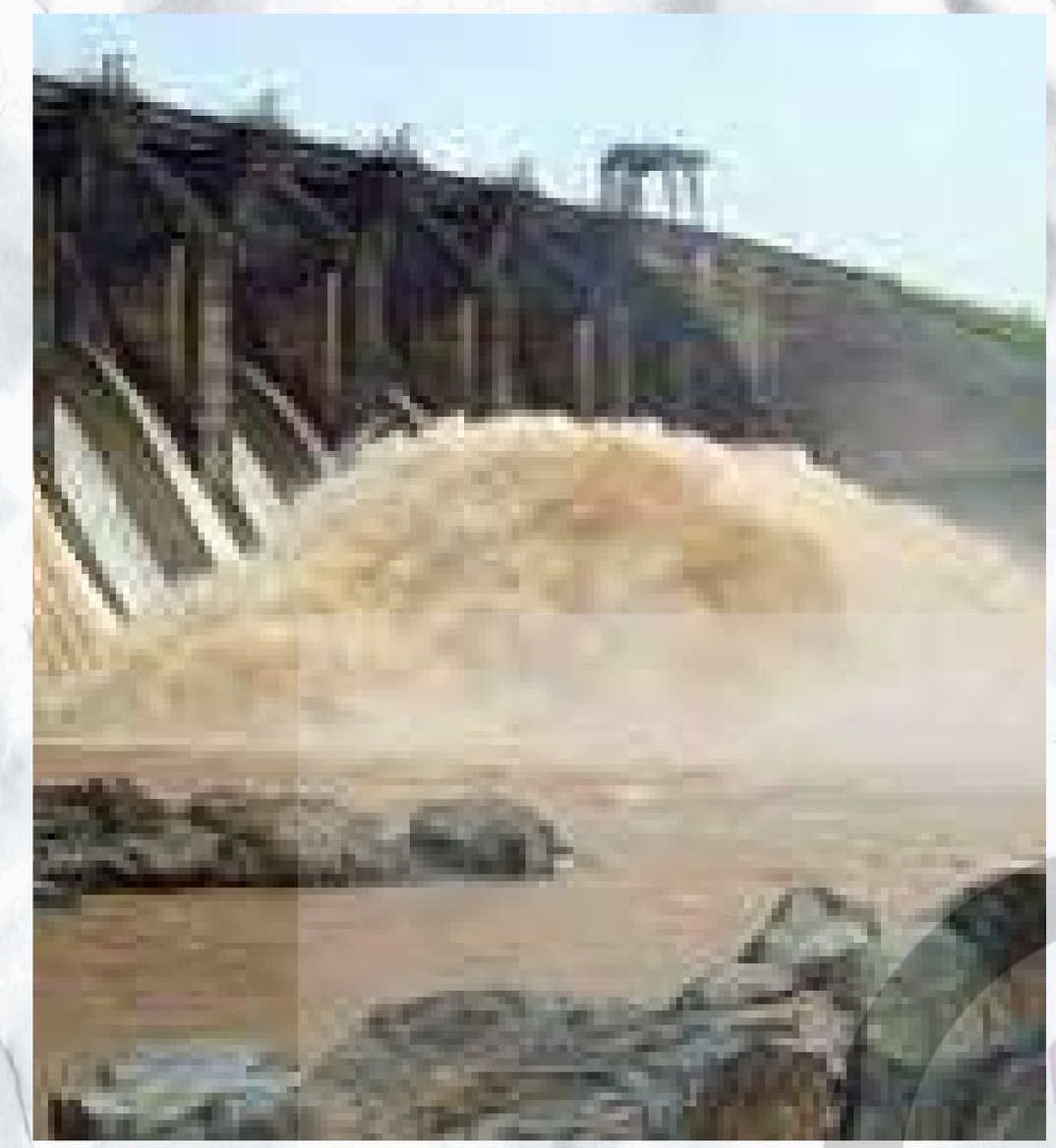

৫০-এ পা দিলো ফারাক্কা বাঁধ।পদ্মা নদীর তীরে দাঁড়ালে এখন আর মাঝিদের চিরচেনা সেই ভাটিয়ালী গান শোনা যায় না। একসময় এই নদীতে ছিল জীবনের মতোই স্পন্দন – কৃষকের ধানের ক্ষেতে সোনালি রঙা ঢেউ, জেলের জালে মাছের নৃত্য, আর প্রকৃতির বিমূর্ত করে দেয়ার মতো সৌন্দর্য-উত্তরবঙ্গের মানুষের দৈনিক জীবনের একটা বড় অংশ নির্ভর ছিল পদ্মা আর এর শাখানদী গুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধ যেন নদীর সাথে সাথে উত্তরবঙ্গের মানুষেরও জীবনের সুর থামিয়ে দিয়েছে। পদ্মার বুকে শেকল পরিয়ে এই বাঁধ শুধু নদী নয়, বাংলাদেশের মানুষকেও ছটফট করতে বাধ্য করেছে। পদ্মার তীরের একজন বাসিন্দার কথায়, "যেমন সাপের মুখ চেপে ধরলে সে ছটফট করে, ফারাক্কা বাঁধও আমাদের নদীকে তেমনি কষ্ট দিচ্ছে।" এই কষ্টের গল্প শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতের গঙ্গাপাড়ের মানুষেরও। ফারাক্কা বাঁধ একটি অভিশাপ, যা দুই দেশের সম্পর্কে অস্বস্তির ছায়া ফেলেছে।

ফারাক্কার বিরুদ্ধে ক্ষোভ: বাংলাদেশ থেকে বিহার

১৯৭৫ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পর থেকে পদ্মা নদী শুকিয়ে যেতে যেতে এখন মরুভূমি হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। রাজশাহীর বড়াল, কুষ্টিয়ার গড়াই, আর পদ্মার সঙ্গে জড়িত ১১টি শাখানদী এখন মৃতপ্রায়। সুন্দরবনের কপোতাক্ষ, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা–একসময়ের প্রাণবন্ত নদীগুলো এখন নামেই বেঁচে আছে। কোথাও হাঁটুপানি, কোথাও পানির ছোঁয়াও নেই। শেখ রোকন, রিভারাইন পিপলের মহাসচিব, বলেন, "ফারাক্কার কারণে পদ্মার পানি ৮০% কমে গেছে। নদীর মাছ, পাখি, জলজ প্রাণী–সব হারিয়ে গেছে।" পদ্মার এই মৃত্যু বাংলাদেশের কৃষকের জমি শুকিয়ে দিয়েছে, মৎস্যজীবীর জাল খালি করেছে, আর গ্রামের মানুষের থালায় খাবারের অভাব এনেছে।

কিন্তু এই ক্ষতি শুধু আমাদের নয়। ভারতের বিহারেও ফারাক্কার নারকীয় ছায়া পড়েছে। বর্ষায় জলাবদ্ধতা, খরায় বিপর্যয়–বিহারের মানুষও গঙ্গার এই করুণ পরিস্থিতির শিকার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ফারাক্কা ভেঙে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমনা ব্যানার্জি বলছেন, "ফারাক্কার কারণে গঙ্গায় পলি জমে তীরের জমি ভাঙছে।" নদী বিশেষজ্ঞ হিমাংশু ঠক্করের কথায়, "কলকাতা বন্দর বাঁচানোর জন্য তৈরি এই বাঁধ তার উদ্দেশ্য পূরণ করেনি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা বন্দর রক্ষার বদলে ফারাক্কা এখন রীতিমতো জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ফারাক্কার বিরুদ্ধে আন্দোলন

ফারাক্কার বিরুদ্ধে ক্ষোভ শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতের মাটিতেও জেগেছে। ১৯৭৬ সালে মাওলানা ভাসানী ফারাক্কার বিরুদ্ধে লং মার্চের ডাক দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে এই দিন এখনো 'ফারাক্কা লং মার্চ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। ভারতে অ্যাক্টিভিস্ট মেধা পাটকর ফারাক্কা 'ডি-কমিশন' করার দাবি তুলেছেন। তিনি বলেন, "এই ক্ষতিকর বাঁধ টিকিয়ে রাখার কোনো মানে নেই। আমেরিকায় শতাধিক বাঁধ ভেঙে ফেলা হয়েছে–ফারাক্কাও কেন ভাঙা যাবে না?" মেধার এই কথা আমাদের প্রশ্ন জাগায়–যে বাঁধ জীবনের বদলে ধ্বংস এনেছে, তাকে আর কতদিন বয়ে বেড়াব?

পানির অধিকার

১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গা/পদ্মা পানি চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালে শেষ হবে। কিন্তু গত ২০ বছরে এই চুক্তি পদ্মাকে বাঁচাতে পারেনি। শাখানদীগুলো মৃতপ্রায়, সুন্দরবনের পরিবেশ ধ্বংসের মুখে। শেখ রোকনের পরামর্শ, "চুক্তি নবায়নের পাশাপাশি জাতিসংঘের দুটি সনদ– ইউএন ওয়াটার কনভেনশন (১৯৯২) এবং ইউএন ওয়াটার কোর্সেস কনভেনশন (১৯৯৭)– দ্রুত অনুমোদন করতে হবে।" কিন্তু বাংলাদেশ এখনো ১৯৯৭ সালের সনদ অনুমোদন করেনি, আর ১৯৯২ সালের সনদ স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এই নিষ্ক্রিয়তা আমাদের পদ্মার অধিকারের লড়াইকে দুর্বল করছে।

আমাদের কান্না, আমাদের লড়াই

পদ্মার তীরে দাঁড়ালে এখন শুধু ফাটল ধরা মাটি আর খালি জাল চোখে পড়ে। কৃষকের হাতে ধানের বদলে ধুলো, মৎস্যজীবীর জীবনে হতাশা। সুন্দরবনের নদীগুলো শুকিয়ে গেছে, গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প বন্ধের পথে। ফরাক্কা বাঁধ শুধু পানি কেড়ে নেয়নি, আমাদের সংস্কৃতি, জীবিকা, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্নকেও বিপন্ন করেছে।

আমার গ্রামের এক কাকা বলতেন, "নদী মরে গেলে গ্রাম মরে, গ্রাম মরে গেলে দেশ মরে।" পদ্মা যদি বাঁচে, তবেই আমরা বাঁচব। এখন সময় এসেছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। জাতিসংঘের সনদের আশ্রয় নিয়ে, গঙ্গা চুক্তি নবায়ন করে, আর আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমাদের কণ্ঠ তুলে আমাদের পদ্মার পানির অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। ফরাক্কার শেকল না ভাঙলে পদ্মাও একদিন তার শাখানদীগুলোর মতো হারিয়ে যাবে।

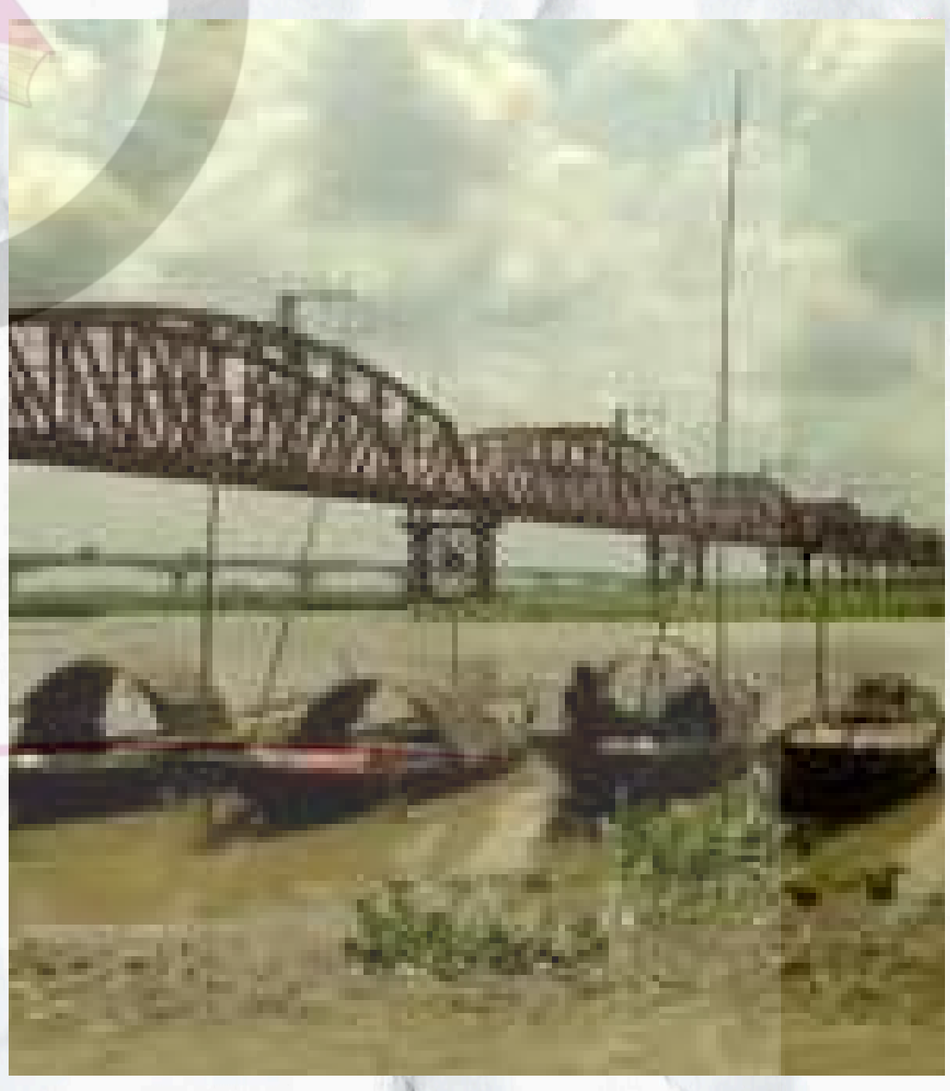

সোর্সঃ

১। https://www.bbc.com/bengali/articles/cly1j90y6dvo

২। https://at-tahreek.com/article_details/9252